পাঠ-সংগ্রহ

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for class VI of all Schools under the West Bengal Board of Secondary Education. Vide Notification No. 10367/G Dt. 24. 11. 1975 [TB/74/VI/TB/204]

পাঠ-সংগ্রহ

(ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য)

মিহিরকুমার গৌতম
শিক্ষক, বালি নিশ্চিন্দা চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়

সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬, বিধান সরণী : কলিকাতা-৬

প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৭৪
দ্বিতীয় সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫
তৃতীয় অনুমোদিত সংস্করণ
নভেম্বর ১৯৭৫
পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৭

দাম : Rs. ৩·৮৪

মুদ্রাকর
বিভাস ভট্টাচার্য
সারস্বত প্রেস
২০৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

শৈশব কথা	:	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১
মন্বন্তর	:	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪
বালক রামতনু ও ডেবিড হেয়ার	:	শিবনাথ শাস্ত্রী	৬
ছেলেবেলার স্মৃতি	:	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
সুয়েজ খালে : হাঙ্গর শিকার	:	স্বামী বিবেকানন্দ	১৪
সগর রাজার কথা	:	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১৯
চৈতন্যদেব	:	দীনেশচন্দ্র সেন	২৪
বুদ্ধকথা	:	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৮
রামের কীর্তি	:	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩২
প্রাচীন ভারতের উদ্ভিদশাস্ত্র	:	জগদানন্দ রায়	৩৬
আতুরী ডাইনী	:	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৯
বীরসা ভগবান	:	নলিনীকুমার ভদ্র	৪৪

পদ্যাংশ

প্রার্থনা	:	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৭
ভরতের রাজ্যশাসন	:	কৃত্তিবাস ওঝা	৪৮
দক্ষযজ্ঞনাশ	:	ভারতচন্দ্র রায়	৫০
সমাধি লিপি	:	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৫১
প্রশ্ন	:	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫২
কামনা	:	কামিনী রায়	৫৩

আমার দেশ	:	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	৫৪
বাসনা	:	করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৬
ছিন্ন-মুকুল	:	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৮
অ-কেজোর গান	:	কাজী নজরুল ইসলাম	৬০
গন্ধ বিচার	:	সুকুমার রায়	৬১
রূপাই	:	জসীম উদ্দীন	৬৩
কুকুরপাগল	:	অন্নদাশঙ্কর রায়	৬৪
এক যে ছিল	:	সুকান্ত ভট্টাচার্য	৬৬

প্রবেশ করছে, তাবৎ সেই হাঙ্গর লবণসমুদ্রজন্মা, বঁড়শি সংলগ্ন শোরের মাংসের তালটি উদরাগ্নিতে ভস্মাবশেষ করবার জন্য, পালভরে নৌকার মতো সোঁ করে সামনে এসে পড়লেন। আর পাঁচ হাত—এইবার হাঙ্গরের মুখ টোপে ঠেকেছে। সে ভীম পুচ্ছ একটু হেললো—সোজা গতি চক্রাকারে পরিণত হল। যাঃ, হাঙ্গর চলে গেল যে!

কিন্তু নেহাৎ হতাশ হবার প্রয়োজন নেই—ঐ যে পলায়মান 'বাঘার' গা ঘেঁষে আর একটা প্রকাণ্ড 'থ্যাবড়ামুখো' চলে আসছে! টোপটা মুখে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে! দেখুক। এইবার চিৎ হল—ঐ যে আড়ে গিলছে; চুপ—গিলতে দাও। তখন 'থ্যাবড়া' অবসরক্রমে, আড় হয়ে, টোপ উদরস্থ করে যেমন চলে যাবে, অমনি পড়ল টান! বিস্মিত 'থ্যাবড়া' মুখ ঝেড়ে, চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে—উলটো উৎপত্তি!! বঁড়শি গেল বিঁধে, আর ওপরে ছেলে বুড়ো জোয়ান, দে টান—কাছি ধরে দে টান্। ঐ হাঙ্গরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠল—ঐ যে—প্রায় আধখানা হাঙ্গর জলের ওপর! বাপ কি মুখ! ও যে সবটাই মুখ আর গলা! ও আরব পুলিশ মাঝি, ওর ল্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও তো—নইলে যে এত বড় জানোয়ার টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে ভাই, ও ল্যাজের ঝাপ্‌টায় ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙে যায়। আবার টান্—ওকি? হাঙ্গরের পেটের নিচে দিয়ে ও ঝুলছে কি? ও যে—নাড়ীভুঁড়ি! নিজের ভারে নিজের নাড়ীভুঁড়ি বেরুল যে! যাক, ওটা কেটে দাও, জলে পড়ুক, বোঝা কমুক; টান্ ভাই টান্। এ যে রক্তের ফোয়ারা! আর কাপড়ের মায়া করলে চলবে না। টান্—এই এল। এইবার জাহাজের ওপর ফেলো। ভাই হুঁশিয়ার, খুব হুঁশিয়ার,—আর ঐ ল্যাজ সাবধান। এইবার, এইবার দড়ি

ছাড়—ধুপ্ ! বাবা, কি হাঙ্গর ! কি ধপাৎ করেই জাহাজের ওপর পড়লো ! রক্তমাখা গায়-কাপড়ে ফৌজি যাত্রী কড়িকাঠ উঠিয়ে দুম্ দুম্ দিতে লাগলো হাঙ্গরের মাথায়, আর মেয়েরা 'আহা কি নিষ্ঠুর ! মেরো না' ইত্যাদি চীৎকার করতে লাগলো—অথচ দেখতেও ছাড়বে না। তারপর সে বীভৎস কাণ্ড এইখানেই বিরাম হোক। কেমন করে সে হাঙ্গরের পেট চেরা হল, কেমন রক্তের নদী বইতে লাগলো, কেমন সে হাঙ্গর ছিন্ন-অন্ত্র, ভিন্ন-দেহ, ছিন্ন-হৃদয় হয়েও কতক্ষণ কাঁপতে লাগলো, নড়তে লাগলো ; কেমন করে তার পেট থেকে অস্থি, চর্ম, মাংস, কাঠ-কুটরো একরাশ বেরুল—সে সব কথা থাক। এই পর্যন্ত যে, সেদিন আমার খাওয়া-দাওয়ার দফা মাটি হয়ে গিয়েছিল। সব জিনিসেই সেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হতে লাগলো।

অনুশীলনী

১। কোন কোন বন্দরে বেশি হাঙ্গর দেখা যায় ? সকালবেলা হাঙ্গরের খবর শুনিয়া লেখক জাহাজের ডেকে আসিয়া কি দেখিয়াছিলেন ?

২। বনিটো কি ? হাঙ্গরের সঙ্গে তার প্রভেদ কি ? লেখক হাঙ্গরের আবির্ভাবের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় লিখ।

৩। 'কুয়োর ঘটি তোলার' ঠাকুর দাদা কে ? ইহা কিভাবে হাঙ্গর শিকারের আয়োজনে লাগিল ?

৪। হাঙ্গর শিকারের কাহিনীটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

৫। অর্থ বল ও বাক্য গঠন কর :—

বন্দর, জাতক্রোধ, গাঙ্‌ধাড়া, কর্ণকুহর, লবণসমুদ্রজন্মা, উদরাগ্নি।

সগর রাজার কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ইক্ষ্বাকু বংশে সগর নামে একজন অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বীরত্বে তাঁহার সমান আর সেকালে কোন রাজাই ছিলেন না। সকল বিষয়েই তিনি সুখী ছিলেন, কেবল এক বিষয়ে তাঁহার বড়ই দুঃখ ছিল, তাঁহার পুত্র ছিল না। পুত্র লাভের



রাজা জোড় হাতে বলিলেন, 'যাহাতে আমার পুত্র হয়, এমন বর দিন'

জন্য তিনি তাঁহার বৈদর্ভী এবং শৈব্যা নাম্নী দুই রানীকে লইয়া কৈলাস পর্বতে গিয়া কঠিন তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে, শিব রাজার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, তুমি কি চাহ?'

রাজা ভক্তিভরে শিবকে প্রণাম করিয়া, জোড় হাতে বলিলেন, 'ভগবন্, আমার পুত্র নাই। সুতরাং, যদি আমার প্রতি আপনার দয়া হইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া, যাহাতে আমার পুত্র হয়, এমন বর দিন।'

শিব কহিলেন, 'মহারাজ, তোমার এক রানীর ষাট হাজার পুত্র হইবে, কিন্তু তাহারা সকলেই একসঙ্গে মরিয়া যাইবে। আর-এক রানীর একটি মাত্র পুত্র হইবে, সে-ই তোমার বংশ রক্ষা করিবে।'

কিছুদিন পরে বৈদর্ভীর ষাট হাজার আর শৈব্যার একটি পুত্র হইল। বৈদর্ভীর ষাট হাজার পুত্র জন্মিবার সময় বড়ই আশ্চর্য ঘটনা হয়। ছেলেগুলি একটি লাউয়ের ভিতরে ছিল। লাউ দেখিয়া রাজা তাহা ফেলিয়া দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, এমন সময় আকাশ হইতে কে যেন অতি গভীর স্বরে বলিল, 'মহারাজ, ওটাকে ফেলিয়া দিও না। উহার ভিতরেই তোমার ষাট হাজার পুত্র আছে। উহার ষাট হাজারটি বীচিকে ঘৃতের কলসির ভিতর রাখিয়া দাও, দেখিবে তোমার ষাট হাজার পুত্র হইবে।'

সুতরাং রাজা আর লাউটি ফেলিয়া না দিয়া, উহার বীচিগুলি ঘিয়ের ভিতরে রাখিয়া দিলেন। ইহাতে অনেক দিন পরে, সেই বীচির ভিতর হইতে ষাট হাজারটি সুন্দর খোকা বাহির হইল! সেই খোকাগুলি বড় হইয়া ষাট হাজারটি অসুরের মতন গোঁয়ার গুণ্ডা হইল। তাহাদের জ্বালায় মানুষের কথা আর কি বলিব, দেবতা গন্ধর্ব পর্যন্ত সুস্থির হইয়া বসিতে পাইত না।

শেষে সকলে ইহাদের দৌরাত্ম্যে জ্বালাতন হইয়া, ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিল, 'ভগবন্, আর তো পারি না! ইহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণের একটা উপায় করুন!'

ব্রহ্মা বলিলেন, 'তোমাদের কোন চিন্তা নাই। আর অতি অল্প দিনের ভিতরেই ইহারা নিজের স্বভাব দোষে নষ্ট হইবে।'

তারপর সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞের ঘোড়ার রক্ষক হইল ঐ ষাট হাজার রাজপুত্র। তাহারা দিনকতক তাহাকে দেশে দেশে তাড়াইয়া ফিরিল। সে শুকনো সাগরের বালির উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে কোথায় যে চলিয়া গেল, রাজপুত্রেরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। তখন তাহারা দেশে ফিরিয়া তাহাদের পিতাকে বলিল, 'বাবা, সর্বনাশ তো হইয়াছে, ঘোড়া হারাইয়া গিয়াছে!'

এ কথা শুনিয়া সগর বলিলেন, 'তোমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে খুব ভাল করিয়া খোঁজ।'

তখন রাজপুত্রেরা আবার ঘোড়া খুঁজিতে বাহির হইল, কিন্তু সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান করিতে পারিল না। সুতরাং, তাহারা আবার তাহাদের পিতার নিকট আসিয়া বিনয়ের সহিত বলিল, 'বাবা, আমরা শহর, বাজার, পাহাড়, পর্বত, বন, বাদাড়, কিছুই বাকি রাখি নাই। কিন্তু ঘোড়া তো কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না!'

এ কথায় সগর রাজা অস্থির হইয়া বলিলেন, 'দূর হ তোরা এখান হইতে! ঘোড়া না লইয়া তোরা আর দেশে মুখ দেখাইতে পাইবি না।'

সুতরাং আবার ষাট হাজার ভাই ঘোড়ার সন্ধানে বাহির হইল। খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা আবার সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, তাহার এক জায়গায় একটি গভীর গর্ত রহিয়াছে। তখন ষাট হাজার ভাই, ষাট হাজার কোদাল লইয়া সেই গর্তের চারিধারে খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অনেক খুঁড়িয়াও তাহারা সেই সর্বনেশে গর্তের তলা পাইল না।

এমনি করিয়া খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাহারা একেবারে পাতালে গিয়া

উপস্থিত হইল। পাতালে গিয়াই তাহারা দেখিল যে, সেখানে কপিল মুনি বসিয়া আছেন, আর ঘোড়াটি তাঁহার কাছেই ঘাস খাইতেছে। ঘোড়া দেখিয়া আর কি তাহারা স্থির থাকিতে পারে? তখন কপিল যে সেখানে বসিয়া আছেন তাহা যেন তাহারা দেখিয়াও দেখিতে পাইল না। কপিলকে অগ্রাহ্য করিয়াই তাহারা ঘোড়া ধরিতে ছুটিয়া চলিল।

ইহাতে কপিল রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে দুই চক্ষু লাল করিয়া ভীষণ ভ্রূকুটির সহিত উহাদিগের পানে তাকাইবামাত্র সেই ষাট হাজার রাজপুত্র পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

যখন এই ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়, তখন নারদ মুনি সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন। তিনিই রাজপুত্রগণের মৃত্যুর সংবাদ সগরকে শুনান। পুত্রদিগের মৃত্যুর কথা শুনিয়া সগর দুঃখে অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। তারপর নিজের নাতি অংশুমানকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, 'এখন তুমি ঘোড়া না আনিতে পারিলে তো আর উপায় দেখি না।' শৈব্যার যে একটি পুত্র হয়, তাহার নাম ছিল অসমঞ্জা। অংশুমান সেই অসমঞ্জার পুত্র।

সগরের কথায় অংশুমান সেই গর্তের ভিতর দিয়া পাতালে চলিয়া গেলেন। কপিল তখনো সেখানে বসিয়া ছিলেন, আর ঘোড়াটাও তাঁহার কাছে ছিল। অংশুমান মুনিকে দেখিবামাত্র ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করাতে, মুনি তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'বাঃ, বেশ তো ছেলেটি! তুমি কি চাও বৎস?'

অংশুমান জোড়হাতে বলিলেন, 'ভগবন্, আপনি দয়া করিয়া ঘোড়াটি আমাকে দিলে আমাদের যজ্ঞ শেষ হইতে পারে।'

মুনি বলিলেন, 'বটে? তোমাদের যজ্ঞের ঘোড়া? এখনি তুমি ওটাকে নিয়া যাও। তোমার আর কিছু চাই?'

অংশুমান জোড়হাতে বলিলেন, 'ভগবন্, দয়া করিয়া যদি আমার খুড়ামহাশয়দিগকে উদ্ধার করিয়া দেন তবে বড় ভাল হয়।'

মুনি বলিলেন, 'তুমি যখন চাহিতেছ, তখন তাহাও হইবে। কিন্তু সে এখন নহে, আর তাহা এত সহজে হইবে না। তোমার যে নাতি হইবে, সে মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া তাঁহার সাহায্যে, গঙ্গাদেবীকে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে লইয়া আসিবে। সেই স্বর্গের নদী গঙ্গার জল লাগিলে, তোমার খুড়াগণ উদ্ধার পাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এখন শীঘ্র ঘোড়া লইয়া দেশে গিয়া যজ্ঞ শেষ কর, তোমার মঙ্গল হউক।'

এইরূপে অংশুমান ঘোড়া লইয়া দেশে ফিরিলে, সগরের অশ্বমেধ শেষ হইল।

অনুশীলনী

১। সগর কোন বংশীয় রাজা ছিলেন? তাঁহার কিসের দুঃখ ছিল? দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি কি করিয়াছিলেন?

২। শিব সগরকে কি বর দেন? বৈদর্ভীর ষাট হাজার পুত্র জন্মিবার সময় কি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল?

৩। রাজার পুত্রগুলির স্বভাব কিরূপ ছিল? দেবতা গন্ধর্বগণ তাহাদের সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন?

৪। যজ্ঞের ঘোড়া কিরূপে হারাইয়া গিয়াছিল? ঘোড়া খুঁজিতে গিয়া তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল?

৫। পুত্রদিগের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সগর ঘোড়া উদ্ধারের জন্য কাহাকে পাঠাইলেন? তিনি কি করিয়া ঘোড়া উদ্ধার করিলেন?

৬। টীকা লিখ:—

ইক্ষ্বাকু বংশ, সগর, অশ্বমেধযজ্ঞ, গন্ধর্ব, কপিল মুনি।

চৈতন্যদেব

দীনেশচন্দ্র সেন

১৪০৭ শকে ১২ই ফাল্গুন রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণের সময় চৈতন্যের জন্ম হয়। বাঙ্গালা দেশে কোটি লোক জন্মিতেছে, মরিতেছে, কিন্তু এই ব্রাহ্মণ বালকের মত এ পর্যন্ত একটি ছেলেও এদেশে জন্মেন নাই। চৈতন্যদেব তাঁহার প্রকৃত নাম নয়। তাঁহার প্রকৃত নাম বিশ্বম্ভর। ইহার পিতৃকুলের উপাধি ছিল মিশ্র। জগন্নাথ মিশ্রের পিতামহ মধুকর মিশ্র উড়িষ্যার রাজার অত্যাচারে যাজপুর হইতে একেবারে দীর্ঘপ্রস্থান করিয়া শ্রীহট্টের অন্তর্গত ঢাকা দক্ষিণ নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। মধুকর মিশ্রের পুত্রদ্বয়ের নাম উপেন্দ্র ও জগন্নাথ মিশ্র। এই জগন্নাথ মিশ্রই চৈতন্যদেবের পিতা।



চৈতন্যদেব

চৈতন্যদেবের একটি বড় ভাই ছিল। তাঁহার নাম বিশ্বরূপ। এইরূপ শোনা যায়—তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শঙ্করাণ্যপুরী উপাধি লইয়া তপস্যার জন্য বনবাসী হইয়াছিলেন।

বিশ্বরূপের অন্তর্ধানের পর জগন্নাথ মিশ্র পঞ্চ বৎসরের শিশু বিশ্বম্ভরের পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিলেন, পাছে লেখাপড়া শিখিয়া এই পুত্রটিও ঘরবাড়ি ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া যায়। কিন্তু লেখাপড়া

ছাড়িয়া পাঁচ বৎসরের শিশু একটি দস্যুতে পরিণত হইল। কাহারো কলাবাগানে পাকা কলা চুরি করা, গঙ্গাস্নান করিতে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ যাইতেন, তাহাদের চাদর ও কাপড় জলে ভিজাইয়া রাখা—ইত্যাদি-রূপ তৎকৃৎ নানা অত্যাচার পাড়া পড়শীদের অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রতিবেশীদের অনুরোধ উপরোধে বাধ্য হইয়া জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে টোলে পাঠাইলেন। বিষ্ণুদাস, সুদর্শন ও গঙ্গাদাস—এই তিন পণ্ডিতের টোলে নিমাই পাঠ করেন ও অতি অল্প বয়সে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত বলিয়া নবদ্বীপের সুধীসমাজে পরিচিত হন। বাসুদেব দত্ত নামক এক অর্থশালী ব্যক্তির বাটীতে সতের বৎসর বয়সে তিনি টোল স্থাপন করেন। এই টোলে তিনি ব্যাকরণের একখানি 'টিপ্পনী' প্রস্তুত করেন। এই টিপ্পনীখানির নাম 'বিদ্যাসাগর টিপ্পনী'। ইহা সেই সময়ে বঙ্গদেশের সমস্ত টোলের ছাত্রেরা পড়িত। পাঠশেষে বিশ্বম্ভরের উপাধি হইয়াছিল—'বিদ্যাসাগর'। তিনি আর একটি উপাধিও পাইয়াছিলেন। কেশব কাশ্মীরী নামক এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত নবদ্বীপে আগমনপূর্বক তথাকার পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। চৈতন্যদেব তর্কযুদ্ধে বড় বড় পণ্ডিতদিগকে হারাইয়া দিতেন; সুতরাং বুড়া অধ্যাপকেরা কেশব কাশ্মীরীকে ইহারই নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অজাতশ্মশ্রু বালকের নিকট পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলেন। নবদ্বীপের সমস্ত পণ্ডিত সেইদিনে একত্র হইয়া চৈতন্যদেবের উপাধি দিলেন—'বাদীসিংহ'।

এই সময় চৈতন্যদেবের পিতার মৃত্যু হয়। তিনি মাতার নিকট বিদায় লইয়া পিতৃপিণ্ড প্রদান করিবার জন্য গয়ায় গমন করিলেন। পথে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে মিলন হইল। ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে ঘন ঘন অশ্রু পড়িতে লাগিল।

ইহার পর গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্মদর্শন। সে এক অপূর্ব কথা।

চারিদিক হইতে শত শত পুষ্পমাল্য পাদপদ্মের উপর পড়িতেছে। কত পট্টবস্ত্র, কত অলঙ্কার যাত্রীরা সেই পাদপদ্মে নিবেদন করিতেছে! পাণ্ডারা দেখিল, এক দেবতুল্য আকৃতি পরম-সুদর্শন যুবক কাঁদিতে কাঁদিতে সেই পাদপদ্মের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তদবস্থায় সঙ্গীরা তাঁহাকে ধরিয়া বাসাবাড়িতে লইয়া আসিল। চৈতন্য হওয়ার পরে তিনি বলিলেন, 'তোমরা ফিরিয়া যাও, আমি আমার প্রাণনাথকে দেখিয়াছি। আমি বৃন্দাবন চলিলাম। আমি আর ঘরে ফিরিব না।'

...সকলেই যখন ঠিক করিল যে, চৈতন্যদেব পাগল হইয়াছেন, তখন শচীদেবী শ্রীবাসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইনি প্রবীণ ও নবদ্বীপের মধ্যে অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি। চৈতন্য ঘরের কোণে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। শ্রীবাস ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই ঘণ্টা পরে তিনি বাহির হইলে শচীদেবী দেখিলেন—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চক্ষু জলে টলমল করিতেছে। শ্রীবাস শচীদেবীকে বলিলেন, 'কাহাকে তোমরা পাগল বলিয়াছ? আজ যাঁহাকে দেখিলাম, সে রূপ জগতে আর কেহ দেখে নাই।'

কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীবাস চলিয়া গেলেন। তারপর হইতে শ্রীবাসের প্রশস্ত আঙ্গিনায় রোজ রোজ সায়াহ্নে খোল বাজিয়া উঠিত। যেদিন কাজী নদীয়ার চাঁদকে কীর্তন করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন, সেদিন চৈতন্য শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ লোক লইয়া কীর্তন করিতে বাহির হইলেন। সেকি অপূর্ব অভিযান! নদীয়া সেদিন বৈকুণ্ঠ। লক্ষ লক্ষ হস্তে মশাল, শত শত মৃদঙ্গ, সহস্র সহস্র করতাল!

কিন্তু চৈতন্যকেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইল। নবদ্বীপের ভট্টাচার্য পণ্ডিতেরা দর্শন শাস্ত্রের তর্কযুক্তি লইয়া বিচার করিয়া বলিলেন, 'কোন শাস্ত্রে এ রকম লেখে না যে, জয়ঢাক বাজাইয়া রাস্তায় রাস্তায় ভগবানের নাম লইতে হইবে।' চৈতন্য ভাবিলেন,

'গৃহীর মুখে ইহারা হরিনাম শুনিবে না। আমি সন্ন্যাসী হইব এবং দুয়ারে দুয়ারে তাঁহার নাম গাহিব।' চৈতন্য মাতার নিকট অনুমতি চাহিলেন। মাতা যখন অনুমতি দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না, তখন চৈতন্যদেব বলিলেন—'মা, তুমি সেই দেশের মেয়ে—যেখানে কৌশল্যা রামকে বনবাসের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। এদেশ ধর্মশীলা ত্যাগশীলা নারীর দেশ। তুমি পুত্রস্নেহের নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃত সত্যদৃষ্টি ভুলিয়া যাইবে?' শচী দেবী অতীব ধর্মশীলা ছিলেন। তিনি প্রাণপ্রিয় পুত্রকে বিদায় দিলেন।

সন্ন্যাসের পর চৈতন্যদেব যে সকল অদ্ভুত লীলা করিয়াছিলেন, সমস্ত ভারতবর্ষ পর্যটন করিয়া দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, তামিল, কর্ণাট, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে ঘরে ঘরে যে-ভাবে নাম বিতরণ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। ১৪৫৫ শকে শুক্লপক্ষীয় আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিন পুরীধামে তাঁহার অপূর্ব লীলার শেষ হয়। তিনি কিঞ্চিদধিক ৪৮ বৎসর কাল জগতে লীলা করিয়াছিলেন। এই লীলার কথা জগৎ কোন কালেও বিস্মৃত হইবে না।

অনুশীলনী

১। চৈতন্যদেবের পিতার নাম কি? তাঁহার পিতামহ কিভাবে ঢাকা দক্ষিণ নামক গ্রামে আসেন?

২। চৈতন্যদেবের প্রকৃত নাম কি? শৈশবে তাঁহার স্বভাব কিরূপ ছিল?

৩। 'বিদ্যাসাগর টিপ্পনী' বলিতে কি বুঝ? চৈতন্যদেব কিভাবে 'বাদীসিংহ' উপাধি লাভ করেন?

৪। আমি আমার প্রাণনাথকে দেখিয়াছি, আমি বৃন্দাবন চলিলাম— কথাগুলি কে, কখন বলিয়াছিলেন?

৫। চৈতন্যদেবকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইল কেন? সন্ন্যাসের পর কোথায় কোথায় তিনি নাম বিতরণ করেন?

৬। টীকা লিখ:—টোল, ঈশ্বরপুরী, বিষ্ণুপাদপদ্ম, বৃন্দাবন, শ্রীবাস।

বুদ্ধ-কথা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কপিলবাস্তুর রাজবাড়ি। রাজরানী মায়াদেবী সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছেন। ঘরের সামনে খোলা ছাদ, তার ওধারে বাগান, শহর, মন্দির, মঠ। আরো ওধারে—অনেক দূরে হিমালয় পর্বত—শাদা বরফে ঢাকা। আর সেই পাহাড়ের ওধারে আকাশ জুড়ে আশ্চর্য এক শাদা আলো ; তার মাঝে সিঁদুরের টিপের মতো সূর্য উঠছেন! রাজা শুদ্ধোদন এই আশ্চর্য আলোর দিকে চেয়ে আছেন, এমন সময় মায়াদেবী জেগে উঠে বলছেন, 'মহারাজ, কি চমৎকার স্বপ্নই দেখলেম! এতটুকু একটি শ্বেতহস্তী, দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো বাঁকা-বাঁকা কচি দুটি দাঁত, সে যেন হিমালয়ের ওপার থেকে মেঘের উপর দিয়ে আমার কোলে নেমে এল, তারপর যে কোথায় গেল আর দেখতে পেলেম না! আহা, কপালে তার সিঁদুরের টিপের মতো একটি টিপ ছিল।'



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজা-রানী স্বপ্নের কথা বলা-বলি করছেন, ইতিমধ্যে সকাল হয়েছে, রাজবাড়ির নবৎখানার বাঁশি বাজছে, রাস্তা দিয়ে লোকজন চলাফেরা করছে, মন্দির থেকে শাঁখ ঘণ্টার শব্দ আসছে, অন্দর

মহলে রাজদাসীরা সোনার কলসীতে মায়াদেবীর চানের জল তুলে আনছে, মালিনীরা সোনার থালায় পুজোর ফুল গুছিয়ে রাখছে। রানীর পোষা ময়ূর ছাদে এসে উড়ে বসল, সোনার খাঁচায় শুকশারী খাবারের জন্য দাসীদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলে, ভিখিরী এসে —'জয় রানীমা!' বলে দরজায় দাঁড়াল। দেখতে দেখতে বেলা হল, রাজবাড়িতে রানীর স্বপ্নের কথা নিয়ে সকলে বলা-বলি করতে লাগল। কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক, মাথায় মানিকের মুকুট, পরনে লাল চেলী, সকালে সূর্যের মতো রাজা শুদ্ধোদন রাজসিংহাসন আলো করে বসেছেন। পাশে মন্ত্রীবর, তার পাশে দণ্ডধর—সোনার ছড়ি হাতে, ও পাশে ছত্রধর—শ্বেতছত্তর খুলে, তার ওপাশে নগর পাল—ঢাল খাঁড়া নিয়ে।

রাজার দুইদিকে দুই দালান; একদিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর একদিকে দেশবিদেশের রাজা আর রাজপুত্তুর। রাজসভা ঘিরে দেশের প্রজা, তাদের ঘিরে যত দুয়ারী—মোটা রায়বাঁশের লাঠি আর কেবল লাল পাগড়ির ভিড়।

রাজসভার ঠিক মাঝখানে লাল চাঁদোয়ার ঠিক নিচে আটখানি রক্তকম্বলের আসন, তারি উপরে রাজার আট গণৎকার খড়িহাতে, পুঁথি খুলে, রানীর স্বপ্নের কথা গণনা করতে বসেছেন। তাঁদের কারো মাথায় পাকা চুল, কারো মাথায় টাক, কারো বা ঝুঁটি বাঁধা, কারো বা ঝাঁটা গোঁফ! সকলের হাতে এক এক শামুক নস্যি। আট পণ্ডিত কেউ কলমে লিখে, কেউ খড়িতে দেগে রানীর স্বপ্নের ফল গুণে বলছেন:

'এবার নিশ্চয় মহারাজ, এক মহাপুরুষ এই শাক্যবংশে অবতীর্ণ হবেন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হয় না। আনন্দ কর।'

চারিদিকে অমনি রব উঠল—'আনন্দ কর, আনন্দ কর।

অন্নদান কর, বস্ত্রদান কর, দীপদান, ধূপদান, ভূমিদান কর।" কপিলবাস্তুতে রাজার ঘরে, প্রজার ঘরে, হাটে-মাঠে-ঘাটে আনন্দের বাজনা বেজে উঠল, আকাশ আনন্দে হাসতে লাগল, বাতাস আনন্দে বইতে, লাগল, রাজমুকুটের মানিকের দুল, রাজ-ছত্তরের মুক্তোর ঝালর, মন্ত্রীর গলায় রাজার দেওয়া কণ্ঠমালা, পণ্ডিতদের গায়ে রানীর দেওয়া ভোটকম্বল, দাসদাসী, দীনদুঃখী ছেলে-বুড়োর মাথায় রাজবাড়ির লাল চেলী আনন্দে দুলতে থাকল।

প্রকাণ্ড বাগান; বাগানের শেষ দেখা যায় না, কেবলি গাছ, গাছের পর গাছ, আর সবুজ ঘাস; জলের হাওয়া, ঠাণ্ডা ছাওয়া, পাখিদের গান আর ফুলের গন্ধ। বাগানের মাঝে এক প্রকাণ্ড পদ্মপুকুর। পদ্মপুকুরের ধারে আকাশপ্রমাণ এক শালগাছ, তার ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় ফুল ধরেছে; দখিনে বাতাসে সেই ফুল, গাছতলায় একটি শ্বেতপাথরের চৌকির উপরে উড়ে পড়ছে। সন্ধ্যে হয়ে এল। সুরূপা যত পাড়ার মেয়ে পদ্মপুকুরে গা ধুয়ে উঠে গেল। উবু ঝুঁটি, গলায় কাঁটি, দুই কানে সোনার মাকড়ি একদল মালি-মালিনী শুকনো পাতা ঝাঁট দিতে-দিতে, ফুলের গাছে জল দিতে-দিতে, বেলা শেষে বাগানের কাজ সেরে চলে গেল। সবুজ ঘাসে, পুকুর-পাড়ে, গাছের তলায়—কোনোখানে, কোনো কোণে একটু ধুলো, একটি কুটোও রেখে গেল না।

রাত আসছে—বসন্তকালের পূর্ণিমার রাত! পশ্চিমে সূর্য ডুবছেন, পুবে চাঁদ উঠি-উঠি করছেন। পৃথিবীর একপারে সোনার শিখা, আর একপারে রূপার রেখা দেখা যাচ্ছে। মাথার উপর নীল আকাশ, লক্ষকোটি তারায় আর সন্ধি পুজোর শাঁখ ঘণ্টায় ভরে উঠছে। এমন সময় মায়াদেবী রুপোর জালে ঘেরা সোনার পালকিতে সহচরী সঙ্গে বাগান-বেড়াতে এলেন; রানীকে

ঘিরে রাজদাসী যত ফুলের পাখা, পানের বাটা নিয়ে। প্রিয় সখীর হাতে হাত রেখে, ছায়ায়-ছায়ায় চলে ফিরে, রানী এসে বাগানের মাঝে প্রকাণ্ড সেই শালগাছের তলায় দাঁড়ালেন—বাঁ হাতখানি ফুলে-ফুলে ভরা শালগাছের ডালে, আর ডান হাতখানি কোমরে রেখে।

অমনি দিন শেষ হল, পাখিরা একবার কলরব করে উঠল, বাতাসে অনেক ফুলের গন্ধ, আকাশে অনেক তারার আলো ছড়িয়ে পড়ল। পুবে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হলেন—শালগাছটির উপরে যেন একটি সোনার ছাতা! ঠিক সেই সময় বুদ্ধদেব জন্ম নিলেন—যেন একটি সোনার পুতুল, চাঁপাফুলে-ঘেরা পৃথিবীতে যেন আর এক চাঁদ! চারিদিক আলোয়-আলো হয়ে গেল—কোনোখানে আর অন্ধকার রইল না। মায়া মায়ের কোলে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন, পৃথিবীর বুক জুড়িয়ে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন—যেন পদ্মফুলের উপর একফোঁটা শিশির—নির্মল, সুন্দর, এতটুকু। দেখতে-দেখতে লুম্বিনী বাগান লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠল, পাত্র-মিত্র-অনুচর-সভাসদ সঙ্গে রাজা শুদ্ধোদন রাজপুত্রকে দেখতে এলেন। দাসদাসীরা মিলে শাঁখ বাজাতে লাগল, উলু দিতে থাকল।

অনুশীলনী

১। গল্পটি অবলম্বন করিয়া কপিলবাস্তুর রাজবাড়ির একটি বর্ণনা দাও।

২। রাজরানী মায়াদেবী কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন?

৩। গণৎকারের কথায় রাজবাড়িতে যে আনন্দের সাড়া জাগিয়াছিল, তাহা নিজের ভাষায় লিখ।

৪। বুদ্ধদেবের জন্ম মুহূর্তটি বর্ণনা কর।

রামের কীর্তি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না। গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচার যে তাহার কখন কোন দিক দিয়া কি ভাবে দেখা দিবে সে কথা কাহারও অনুমান করিবার যো ছিল না। তাহার বৈমাত্র বড় ভাই শ্যামলালকেও ঠিক শান্ত প্রকৃতির লোক বলা চলে না। গ্রামের জমিদারী কাছারীতে সে কাজ করিত এবং নিজের জমিজমা তদারক করিত। শ্যামলালের পত্নী নারায়ণী যেবার প্রথম ঘর করিতে আসেন—সে আজ তের বছরের কথা—সে বছরে রামের বিধবা জননীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি আড়াই বছরের শিশু রাম এবং এই সমস্ত সংসারটা তাঁহার তের বছরের বালিকা পুত্রবধূ নারায়ণীর হাতে তুলিয়া দিয়া যান।

এ বৎসর চারিদিকে অত্যন্ত জ্বর হইতেছিল। নারায়ণীও জ্বরে পড়িলেন। তিন-চারিটা গ্রামের মধ্যে একমাত্র খানিকটা পাশকরা ডাক্তার নীলমণি সরকারের এক টাকা ভিজিট দু-টাকায় চড়িয়া গেল এবং তাহার কুইনিনের পুরিয়া, আরারুট ময়দা সহযোগে সুখাদ্য হইয়া উঠিল। সাতদিন কাটিয়া গেল, নারায়ণীর জ্বর ছাড়ে না। শ্যামলাল চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

বাড়ির দাসী নৃত্যকালী ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ তাঁকে ভিন গাঁয়ে যেতে হবে—সেখানে চার টাকা ভিজিট—আসতে পারবেন না।

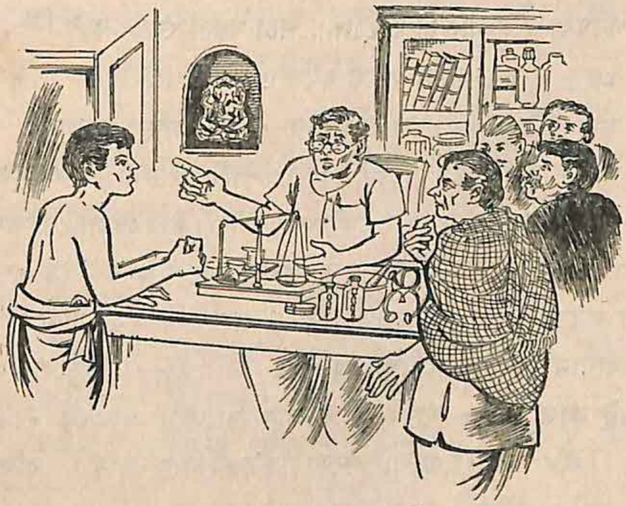
শ্যামলাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমিও না হয় চার টাকাই দেব, টাকা আগে না প্রাণ আগে? যা তুই, চামারটাকে ডেকে আনগে।

রামলাল উঠানের একধারে পিয়ারাতলায় বসিয়া পাখির খাঁচা তৈরী করিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া বলিল, তুই থাক নেত্য, আমি যাচ্ছি।

দেবরটির সাড়া পাইয়া উদ্বেগে নারায়ণী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, ওগো, রামকে মানা কর। ও রাম, মাথা খাস্ আমার যাস্ নে—লক্ষ্মী ভাইটি আমার, ছি দাদা ঝগড়া করতে নেই।

রাম কর্ণপাত করিল না—বাহির হইয়া গেল। পাঁচ বছরের ভ্রাতুষ্পুত্র তখনও কাঠিগুলা ধরিয়া বসিয়াছিল, কহিল, খাঁচা বুনবে না কাকা?

বুনবো অখন—বলিয়া রাম চলিয়া গেল। রাম নীলমণি ডাক্তারের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার তখন ডিসপেনসারিতে,



পচা ময়দা গুঁড়ো তবে নিতে আসিস্ কেন রে?

অর্থাৎ একটা ভাঙ্গা আলমারির সামনে একটা ভাঙ্গা টেবিলে বসিয়া নিক্তি হাতে ঔষধ ওজন করিতেছিলেন। চারি-পাঁচ জন রোগী

হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতেছিল। ডাক্তার আড়-চোখে চাহিয়া নিজের কাজে মন দিলেন।

রাম মিনিট খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বৌদির জ্বর সারে না কেন?

ডাক্তার নিক্তিতে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, আমি কি করব—ওষুধ দিচ্ছি—

ছাই দিচ্ছো! পচা ময়দার গুঁড়োতে অসুখ ভাল হয়!

কথা শুনিয়া নীলমণি ওজন নিক্তি সব ভুলিয়া চোখ রাঙা করিয়া বাক্যশূন্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এতবড় শক্ত কথা মুখে আনিবার স্পর্ধা যে সংসারের কোন মানুষের থাকিতে পারে, তিনি তাহা জানিতেন না।

ক্ষণেক পরে গর্জিয়া উঠিলেন, পচা ময়দা গুঁড়ো তবে নিতে আসিস্ কেন রে? তোর দাদা পায়ে ধ'রে ডাকতে পাঠায় কেন রে?

রাম বলিল, এদিকে ডাক্তার নেই, তাই ডাকতে পাঠায়। থাকলে পাঠাত না। দাদা কারো পায়ে ধরে না। আস্‌বার সময় বৌদিদি মাথার দিব্যি দিয়ে ফেলেছে, নইলে দাঁতগুলো তোমার সত্যই ভেঙ্গে দিয়ে ঘরে যেতুম। তা শোন, ভাল ওষুধ নিয়ে এখনি এস, দেরী ক'রো না। আজ যদি জ্বর না ছাড়ে, ঐ যে সামনে কলমের আমবাগান করেচ, বেশি বড় হয় নি তো—ও কুড়ুলের এক এক ঘায়েই কাত হবে—ওর একটিও আজ রাত্তিরে থাকবে না। কাল এসে শিশি বোতলগুলো গুঁড়ো ক'রে দিয়ে যাব। বলিয়াই সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার নিক্তি ধরিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন।

নারায়ণী বাহিরের দিকের জানালায় চোখ রাখিয়া ছটফট করিতেছিলেন। অনতিকাল পরেই ডাক্তার লইয়া শ্যামলাল ঘরে

ঢুকিলেন। ডাক্তার কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করিয়া পরিশেষে নারায়ণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৌমা, জ্বর সারা না সারা কি ডাক্তারের হাত? তোমার দেওরটি তো আমাকে দুটি দিনের সময় দিয়েছে। এর মধ্যে সারে ভাল, না সারে তো আমার ঘরে দোরে আগুন ধরিয়ে দেবে।

নারায়ণী লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিলেন, ওর ঐ রকম কথা, আপনি ভয় করবেন না।

আজ নীলমণি শোবার ঘরের সিন্দুক খুলিয়া আসল কুইনিন এবং টাটকা ঔষধ আনিয়াছিলেন, তাহাই ব্যবস্থা করিয়া ফিরিবার সময় শ্যামলাল চার টাকা ভিজিট দিতে গেলে তিনি জিভ কাটিয়া বলিলেন, সর্বনাশ! আমার ভিজিট তো এক টাকা! তার বেশি আমি কোনমতেই নিতে পারব না—ও অভ্যাস আমার নেই। শ্যামবাবু, টাকা দু-দিনের, কিন্তু ধর্মটা যে চিরদিনের।

দুইদিন পূর্বে এইখানেই এক টাকার অধিক আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, আজ সে কথাও তিনি বিস্মৃত হইলেন, কিন্তু শ্যামলাল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন।

অনুশীলনী

১। যা চামারটাকে ডেকে আনগে—কে কাহাকে এই কথা বলিয়াছিল? তাহাকে এইকথা কেন বলা হইল?

২। নীলমণি ডাক্তারের বাড়ি আসিয়া রাম কি করিল? ইহার ফল কি হইল?

৩। 'টাকা দু-দিনের, কিন্তু ধর্মটা যে চিরদিনের'—কে কাহাকে কথাগুলি বলিয়াছিলেন? তিনি কেন এই কথা বলিয়াছিলেন?

প্রাচীন ভারতের উদ্ভিদশাস্ত্র

জগদানন্দ রায়

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে শুক্রাচার্য নামে একজন ঋষি ছিলেন। তাঁহার রচিত নীতিশাস্ত্র নামক একখানি পুস্তক আছে। ইহাতে ভারতবর্ষের গাছপালা সম্বন্ধে অনেক বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তা'ছাড়া অথর্ববেদ, চরক সংহিতা, বরাহমিহির রচিত বৃহৎসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত এবং মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে আমাদের দেশের গাছপালার অনেক পরিচয় আছে। হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর এবং পূর্ব ভারতের অনেক জায়গারই গাছপালার বিবরণ নীতিশাস্ত্রে রহিয়াছে।



জগদানন্দ রায়

শুক্রাচার্য সমস্ত গাছপালাকে ফলীন, আরণ্যক এই দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করিয়াছেন এবং আর একভাগে আমাদের নিত্যব্যবহার্য গাছের উল্লেখ করিয়াছেন।

যে সব গাছে ফল হয়, এবং যাহাদের ফল লোকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করে, বা অন্য কাজে লাগায়, শুক্রাচার্য তাহাদিগকেই ফলীন গাছ বলিয়াছেন। যগডুমুর, অশত্থ, বট, তেঁতুল, চন্দন, নাগরঙ্গ (কমলালেবু), কদম, অশোক, বকুল, বেল, অমৃত (নাসপাতি),

কপিত্থক (কতবেল), আম্র, তুঁত, চম্পক, আমড়া, দাড়িম, কুল, নিম, লেবু, খেজুর, সুপারী, নারিকেল, কলা ইত্যাদি প্রায় পঞ্চাশ রকমের ফলীন গাছের বিবরণ শুক্রনীতিতে দেখা যায়।

শাল, তমাল, কূটজ, অর্জুন, পলাশ, সেগুন, ছাতিম, শমী, দেবদারু, ভূর্জ, হরীতকী, ভেলা, আকন্দ, শিমূল ইত্যাদি গাছের নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। এগুলি ভারতের অতি প্রাচীন গাছ। শুক্রাচার্য তাঁহার নীতিশাস্ত্রে এগুলিকেই আরণ্যক নাম দিয়াছেন। ঐ পুস্তকে প্রায় চল্লিশ রকমের আরণ্যক গাছের বিবরণ পাওয়া যায়।

ঘরকন্নার কাজে প্রতিদিনই আপনাদের যে-সব গাছের দরকার হয়, তাহা তোমরা জানো। ধান, সরিষা, বাঁশ, আখ, পান, মুগ, কড়াই, যব, তিল, ছোলা, মুসূর, রসুন, নীল, তূলা, গম, মটর, কুঁচ, রাই—এসব গাছ না পাইলে আমাদের সংসার চলে না। শুক্রাচার্য এই রকম প্রায় পঁচিশটি গাছকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন।

অথর্ব বেদ ভারতের খুব প্রাচীন পুস্তক। অনেক হাজার বৎসর আগে ইহা রচিত হইয়াছিল। ইহাতে মানুষের উপকারী অনেক গাছ-গাছড়ার উল্লেখ আছে এবং সেই সব গাছের স্তব স্তুতিও উহাতে লিখিত আছে। পিঁপুল, ডুমুর, অশথ, কুশ, কুল, শিমূল, বট প্রভৃতি অনেক গাছের বিবরণ অথর্ব বেদে দেখা যায়।

চরক সংহিতাও ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাও বহুশত বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। যে সব গাছ হইতে ঔষধ তৈয়ারী হয়, সেই রকম পাঁচশত গাছের কথা ইহাতে লেখা আছে। এইগুলিকে দশটি বর্গে ভাগ করিয়া চরক ঋষি তাহাদের গুণাগুণ বর্ণনা করিয়াছেন।

এইসব প্রাচীন পুঁথির মধ্যে শুক্রনীতিতেই গাছপালা পালন করার বিষয় বিশেষভাবে লেখা আছে। এমন কি বাগানে কত হাত অন্তর গাছ পুঁতিতে হয়, কোন গাছের গোড়ায় কোন সার দিলে ফল

ভালো ধরে, গাছের শীঘ্র ফল ধরাইতে হইলে কি করা কর্তব্য এবং বাড়ির কোন্ দিকে কোন গাছ পোঁতা উচিত, ইত্যাদি অনেক খুঁটিনাটি কথাও শুক্রনীতিতে লেখা আছে।

আজকালকার উদ্ভিদ-শাস্ত্রে প্রত্যেক গাছের এক একটি বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হইয়া থাকে। এই নাম শুনিলে গাছটির প্রকৃতি কি রকম তাহা একটা অনুমান করা যায়। শুক্রাচার্য ফুল, ফল এবং পাতার আকৃতি লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি গাছের বিশেষ বিশেষ নামও দিয়াছেন। অপরাজিতার ফুলের আকৃতি কতকটা গরুর কানের মতো নয় কি? তাই তিনি ইহাকে গো-কর্ণ নাম দিয়াছেন। ধুতুরার ফুলের চেহারা প্রায় ঘণ্টার মতো। তাই ধুতুরার ফুলকে ঘণ্টাপুষ্প নাম দেওয়া হইয়াছে। তা'ছাড়া গাছের গুণ অনুসারে বিশেষ বিশেষ গাছকে উগ্রগন্ধা, জ্বরান্তক, বাতবৈরী, কৃমিঘ্ন প্রভৃতি বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছিল।

পাতা বুঁজিয়া গাছরা কি-রকমে ঘুমায়, আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা ইহা লক্ষ্য করিয়া পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তা'ছাড়া সূর্যের আলো অনুসারে গাছরা কি-রকমে নড়া-চড়া করে তাহারো বিবরণ দিয়াছেন। প্রাণীদের মতো গাছদেরও ব্যারাম হয়। বিশেষ বিশেষ ব্যারামের চিকিৎসা কি, তাহা সকলে জানে না। তাই গাছের চিকিৎসার কথা কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থে লেখা আছে।

অনুশীলনী

১। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে গাছপালার বিবরণ পাওয়া যায়? গাছ-পালাকে শুক্রাচার্য কিভাবে ভাগ করিয়াছেন?

২। অথর্ববেদ, চরক সংহিতা ও শুক্রনীতি হইতে কি কি কথা জানিতে পারা যায়?

৩। ফুল, ফল ও পাতার আকৃতি এবং গাছের গুণ অনুসারে শুক্রাচার্য তাহাদের কি কি নাম দিয়াছেন?

আতুরী ডাইনী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাদ্র মাস। অপু বৈকালবেলা বেড়াইতে যাইবার সংকল্প করিতেছে, এমন সময় তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলিল—কোথায় বেরুচ্ছিস রে অপু? চালভাজা আর ছোলা ভাজা ভাজছি—বেরিও না যেন। ...এক্ষুনি খাবি—

অপু শুনিয়াও শুনিল না—যদিও সে চাল-ছোলা ভাজা খাইতে ভালবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্য ভাজিতে বসিয়াছে, ইহা সে জানে—তবুও সে কি করিতে পারে?—এতক্ষণ কি খেলাটাই চলিতেছে নীলুদের বাড়িতে? সে যখন বাহির দরজায় পা দিয়াছে, মা'র ডাক আবার কানে গেল—বেরুলি বুঝি! ও অপু, বা রে, ছাখো মজা ছেলের! গরম গরম খাবি—আমি তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে এসে ভাজ্‌তে লাগলাম—ও অপু-উ-উ—

অপু এক ছুট দিয়া নীলুদের বাড়ি গিয়া পৌঁছিল। অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসিবার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। নীলু বলিল—চল অপু, দক্ষিণ মাঠে পাখির ছানা দেখতে যাবি? অপু রাজী হইলে দুজনে দক্ষিণ মাঠে গেল। ধান ক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে! গ্রাম হইতে এক মাইলের উপর হইবে। অপু এতদূর কখনো বেড়াইতে আসে নাই—তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গণ্ডি ছাড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাহাকে টানিয়া আনিল! একটুখানি পরেই সে বলিল, বাড়ি চল নীলুদা, আমায় মা বকবে, সন্দে হ'য়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারবো না। তুমি বাড়ি চল—

ফিরিতে যাইয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহাদের একটা বড় আমবাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল। সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে—এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুই-এ টান দিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল—ও ভাই অপু!

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল—কি রে নীলুদা? পরে সে চাহিয়া দেখিল—যে সুঁড়ি পথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠানে গিয়া শেষ হইয়াছে—উঠানে একখানা ছোট্ট চালাঘর ও একটা বিলাতী আমড়ার গাছ। তাহার কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই নীলু ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল —আতুরী ডাইনীর বাড়ি!

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল…আতুরী ডাইনীর বাড়ি।…সন্ধ্যাবেলা কোথায় আসিয়া তাহারা পড়িয়াছে! কে না জানে যে ওই উঠানের গাছে চুরি করিয়া বিলাতী আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনীটা জেলেপাড়ার কোন এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচারীর আমড়া খাইবার সাধ এ জন্মের মত মিটিয়া যায়! কতদিন শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখে আতুরী ডাইনীর গল্প শুনিতে শুনিতে সে বলিয়াছে—রাত্রিতে তুই ওসব গল্প বলিস্‌নে দিদি, আমার ভয় করে,—তুই সেই কুঁচবরণ রাজকন্যের গল্পটা বল দিকি।

ঝাপসা দৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়ির কেহ আছে কিনা—এবং চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া হিম হইয়া গেল……বেড়ার বাঁশের আগড়ের কাছে অন্য কেহ

নয়, একেবারে স্বয়ং আতুরী ডাইনীই তাহাদের—এমন কি যেন শুধু তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া !

আতুরী বুড়ি ভুরু কুঁচকাইয়া, তোবড়ানো গালটা আরও ঝুলাইয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার ভঙ্গীতে মুখটা সামনের দিকে একটু



এস মোর বাড়িতি এস, আমচুর দোবানি এস—

বাড়াইয়া দিয়া পায়ে পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল।

মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে যে আজ মায়ের মনে কষ্ট দিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া

আসিয়াছে তাহার ফল এই ফলিতে চলিল! সে অসহায় ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আমি কিছু জানিনে—ও বুড়ি পিসি—আমি আর কিছু করবো না—আমায় ছেড়ে দাও, আমি ইদিকে আর কক্ষনো আসবো না—আজ ছেড়ে দাও ও বুড়ি পিসি—

নীলু তো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল—কিন্তু অপুর ভয় এত হইয়াছিল যে, চোখে তাহার জল ছিল না।

বুড়ি বলিল—ভয় কি মোরে ও বাবারা? মোরে ভয় কি?…পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল,—মুই কি ধ'রে নেবো খোকারা? এস মোর বাড়িতি এস—আমচুর দোবানি এস—

আমচুর!……ডাইনী বুড়ি ফাঁকি দিয়ে ভুলাইয়া বাড়িতে পুরিতে চাহিতেছে—গেলেই আর কি! ডাইনীরা রাক্ষসীরা যে এরকম ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলে—এরকম কত গল্প তো সে মার মুখে শুনিয়াছে!

আর কি, সব শেষ! মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিবার আর দেরী নাই, হাত বাড়াইয়া তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনি কচুর পাতায় পু—রিল! প্রতি মুহূর্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল যে এখনি এ বুড়ি হাসিমুখ বদলাইয়া ফেলিয়া বিকট মূর্তি ধরিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিবে—রাক্ষসী রানীর গল্পের মতো! সে আড়ষ্ট কণ্ঠে দিশাহারা ভাবে বলিয়া উঠিল, ও বুড়ি পিসি, আমার মা কাঁদবে, আমায় আজ আর কিছু বোলো না—আমি তোমার গাছে কোনোদিন আমড়া নিতে আসিনি—আমার মা কাঁদবে—

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ··বাড়ি, ঘর দোর, গাছপালা, নীলু, চারিধার যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। কেহ কোনো দিকে নাই…… একমাত্র সে আর আতুরী ডাইনীর ক্রূর দৃষ্টিমাখানো একজোড়া চোখ …আর অনেক দূরে কোথায় যেন মা আর তাহার চালভাজা খাওয়ার ডাক।…

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরীয়া সাহস যোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্তরব করিয়া প্রাণভয়ে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ডিঙ্গাইয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুচোখ যায় ছুটিল—নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে পিছনে।…

ইহাদের ভয়ের কারণ কি বুঝিতে না পারিয়া বুড়ি ভাবিল—মুই মাত্তিও যাই নি, ধত্তিও যাইনি—কাঁচা ছেলে, কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা ? খোকাডা কাদের ?

অনুশীলনী

১। 'বেরুলি বুঝি ! ও অপু, বা রে, দ্যাখো মজা ছেলের !'—কথাগুলি কাহার ? ছেলেকে তিনি ডাকিলেন কেন ? অপু বাহির হইয়া পড়িয়াছিল কেন ?

২। 'এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুই-এ টান দিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল—'ও ভাই অপু।'—নীলু কে ? সে ভয় পাইল কেন ? তাহার কথায় অপুর ভয় হইবার কারণ কি ?

৩। 'এস মোর বাড়িতি এস—আমচুর দোবানি এস—'—এই কথাগুলি কে, কখন বলিয়াছিল ? কথাগুলি শুনিয়া অপুর যে সকল কথা মনে হইয়াছিল তাহা নিজের ভাষায় লিখ।

৪। বাক্য গঠন কর :—সাঙ্গ, কুঁচবরণ রাজকন্যে, উপেক্ষা, আশঙ্কা, ক্রূরদৃষ্টি, আর্তরব।

বীরসা ভগবান

নলিনীকুমার ভদ্র

'ভাই সব, এগিয়ে এসো দেশের সেবায়, বন্ধ করো ইংরেজ সরকারকে খাজনা দেওয়া', এদেশে এই উক্তি যাঁর মুখ থেকে প্রথম বেরিয়েছিল তিনি একজন আদিবাসী, নাম বীরসা ভগবান।



বীরসা ভগবান

আদিবাসীরা ভারতের খাঁটি মাটির মানুষ। আর্যদের ভারতে আগমনের বহু আগেই তারা এসে এদেশে বসতি স্থাপন করেছিল। তাই এদেশের মাটির সঙ্গে তাদের একেবারে নাড়ীর যোগ। বিদেশী শাসনকে কখনো তারা নির্বিবাদে মেনে নিতে পারে নি। মুসলমান যুগের কথা ছেড়েই দিলাম, ব্রিটিশ আমলেও তারা বারবার পরবশ্যতার হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। এই সকল আদিবাসী দেশপ্রেমিক বীরবৃন্দের কথা বাদ দিলে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হতে পারে না। আদিবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বাস্তবিকই ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি

গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। মহাত্মা গান্ধীরও আগে মুণ্ডানেতা বীরসা ভগবান যে মুণ্ডাদের মুলুকে করবন্ধ আন্দোলনের প্রবর্তন করেন, সে খবর আমরা কয়জন রাখি! ভগবান তাঁর কৌলিক পদবী নয়, তাঁর স্ব-জাতিরা তাঁকে বসিয়েছিল দেবতার আসনে। তাই তো আজও তিনি তাদের নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন বীরসা ভগবান—এই নামে।

ভারতের মুক্তি সাধকদের অন্যতম বীরসা ভগবান। মহাত্মা গান্ধীর বহু পূর্বে এই আদিবাসী নেতা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্যতম অস্ত্ররূপে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের প্রবর্তন করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে একটি নূতন সমরনীতি প্রবর্তনের গৌরব যেমন এই আদিবাসী নেতার প্রাপ্য, তেমনি তাঁর অনুগামী মুণ্ডা যুবকদের আত্মদানের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

১৮৭৪ সালে রাঁচির এক মুণ্ডা পরিবারে বীরসার জন্ম হয়। ছোটবেলায় তিনি খ্রীষ্টান মিশনারীদের এক স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শেখেন, সামান্য ইংরেজীও তিনি শিখেছিলেন। জার্মান মিশনারী কর্তৃক তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন খ্রীষ্টধর্মে।

জাতির দুঃখদুর্গতি কিশোর বয়সেই বীরসার মনকে বেদনায় পরিপূর্ণ করে তুলল। ইংরেজের অত্যাচার থেকে স্বজাতি মুণ্ডাদের কি ভাবে বাঁচানো যায় তাই হল তাঁর একমাত্র ভাবনা। রাঁচি থেকে একদিন চলে গেলেন তিনি পাহাড়ের উপরকার তাঁর নিরালা পল্লীকুটিরে। গ্রামবাসীদের ডেকে বললেন: 'ভাই সব, তোমরা ওঠো, জাগো। দেবতা স্বপ্নে আমায় প্রত্যাদেশ দিয়েছেন—মুণ্ডাদের এবার দেশের কাজে লাগতে হবে। তোমরা মদ ছাড়, পৈতে নাও, নিরামিষ খাওয়া শুরু করো।'

বীরসার কথায় মুণ্ডারা এক নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল,

মুণ্ডাদের এলাকায় জাগল এক প্রবল আন্দোলনের সাড়া। বীরসার নির্দেশে তারা সরকারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করলে। ফলে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে বাধল বীরসাপন্থীদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। মুণ্ডারা ক্ষেপে গিয়ে থানা কাছারি আদালত ইত্যাদি পুড়িয়ে দিতে লাগল এবং রেলপথ ধ্বংস ও টেলিগ্রাফের তার কেটে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিলে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট মনে মনে প্রমাদ গণলেন। অবশেষে বীরসাকে গ্রেফ্‌তার করে রাঁচি জেলে এনে বন্দী করে রাখা হল।

যেদিন বীরসা ভগবানকে জেলে পোরা হয় সেই রাত্রিতেই মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল, উঠল প্রচণ্ড ঝড়—এই জননায়কের লাঞ্ছনায় প্রকৃতি যেন ক্ষেপে উঠল। ঝড়ের ঝাপটায় ধসে পড়ে গেল রাঁচি জেলের প্রাচীর। বীরসাকে তখন সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হল হাজারিবাগ জেলে। কিন্তু ইংরেজের সাধ্য কি এই মুক্তিপূজারীকে বন্দীশালায় আটক রাখে। হাজারিবাগ জেলে ১৯০২ সালে বীরসার জীবনান্ত হল।

অনুশীলনী

১। ভারতের আদিবাসী কাহারা? স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ইহাদের দান কি?

২। মহাত্মা গান্ধীরও পূর্বে ভারতবর্ষে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের প্রবর্তন কে করিয়াছিলেন? আদিবাসী নেতা বীরসা ভগবানের জীবনী নিজের ভাষায় লিখ।

৩। অর্থ বল এবং বাক্য রচনা কর :—

নাড়ীর যোগ, সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ, গৌরবোজ্জ্বল, সমরনীতি, অনুপ্রাণিত, জীবনান্ত।

পদ্যাংশ

প্রার্থনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।

নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয় ॥

অনুশীলনী

১। ছন্দ ও যতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। দুঃখ ও বিপদে পড়িয়া আমরা যে সকল প্রার্থনা করি, তাহার সঙ্গে কবির প্রার্থনার প্রভেদ কি?

৩। কবির প্রার্থনাগুলি তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

৪। অর্থ বল ও বাক্য রচনা কর:—দুঃখ-তাপ, টুটে, বঞ্চনা, নম্রশিরে, নিখিল ধরা, সংশয়।

ভরতের রাজ্যশাসন

কৃত্তিবাস ওঝা

জোড়হাতে ভরত বলেন সবিনয়।
কেমনে রাখিব রাজ্য, মম কার্য নয় ॥
তোমার পাদুকা দেহ, করি গিয়া রাজা।
তবে সে পারিব রাম, পালিবারে প্রজা।
তোমার পাদুকা যদি থাকে রাম, ঘরে।
ত্রিভুবনে আমার কি করে কার ডরে ॥
শ্রীরাম বলেন, হে ভরত প্রাণাধিক।
পাদুকা লইয়া যাও, কি কব অধিক ॥

নন্দিগ্রামে পাট করি কর রাজকার্য।
সাবধান হইয়া পালিহ পিতৃরাজ্য ॥
শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে ॥
পাদুকার অভিষেক করিয়া তথায়।
চলিলেন ভরত শ্রীরামের আজ্ঞায় ॥
সৈন্যগণ সহিত ভরত অতঃপরে।
তিন দিনে আইলেন অযোধ্যানগরে ॥
বিশ্বকর্মে পাঠাইয়া দেন ভগবান।
নন্দিগ্রামে অট্টালিকা করিল নির্মাণ ॥
রত্নসিংহাসনেতে ভরত পট্ট পাতি।
তদুপরি পাদুকা থুইয়া ধরে ছাতি ॥
তার নীচে শ্রীভরত কৃষ্ণসারচর্মে।
পাত্র মিত্র সহিত থাকেন রাজকর্মে ॥
কৃত্তিবাস কবির সঙ্গীত সুধাভাণ্ড।
বিচিত্র মধুর গীত এ অযোধ্যাকাণ্ড ॥

অনুশীলনী

১। ছন্দের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। ভরত রামকে কি বলিলেন? রামচন্দ্র তাহার কি উত্তর দিলেন? রাম অযোধ্যায় ফিরিতে না চাহিলে ভরত কি করিলেন?

৩। অর্থ বল: সবিনয়, প্রাণাধিক, পাট করি, পালিহ, বিশ্বকর্মে, পট্ট, কৃষ্ণসার-চর্ম, সুধাভাণ্ড।

দক্ষযজ্ঞনাশ

ভারতচন্দ্র রায়

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দলোক কাঁপিছে॥
সৈন্যস্তূত মন্ত্রপূত দক্ষ দেয় আহুতি।
জন্মি তায় সৈন্য ধায় অশ্ব ঢালি মাহুতি॥
বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া।
যাও যাও হুঁ দিখাও দক্ষ দেই হাঁকিয়া॥
সে সভায় আততায় রুদ্র দেন নিবৃত্তি।
দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিষ্কৃতি॥
রুদ্রদূত ধায় ভূত নন্দীভৃঙ্গি সঙ্গিয়া।
ঘোরবেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গ রঙ্গিয়া॥
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁফ ছিণ্ডিল।
পূষণের ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল॥
যজ্ঞ গেহ ভাঙ্গি কেহ হব্য কব্য খাইছে।
ঊর্ধ্ব হাত বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে॥
মৌন তুণ্ড হেঁট মুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে।
কেহ ধায় মুষ্টি ঘায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে॥
মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তৃণকের ছন্দ-বন্ধ বাড়িছে॥

অনুশীলনী

১। ছন্দের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কবিতাটি স্পষ্টভাবে আবৃত্তি কর।

২। ভূতনাথ কি ভাবে দক্ষযজ্ঞ নাশ করিলেন?

৩। অর্থ বল: ভূতনাথ, যজ্ঞ, প্রেতভাগ, সানুরাগ, সৈন্যসৃত, মাহুতি, বৈরিপক্ষ, রুদ্রবর্গ, হুঁদিখাও, আত্মত্যাগ, নিবৃত্তি, নন্দীভৃঙ্গি, ভার্গব, পূষণ, তৃণক, ছন্দবন্ধ বাড়িছে।

সমাধি লিপি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

দাঁড়াও, পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে। তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে।
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোর সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী॥

অনুশীলনী

১। সমাধি লিপি বলিতে কি বুঝ? কবিতাটির নাম সমাধি লিপি হইবার কারণ কি?

২। ছন্দ ও যতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কবিতাটি আবৃত্তি কর।

৩। কবিতাটির প্রথম পাঁচ লাইনের সহিত শেষ তিন লাইনের বক্তব্যের প্রভেদ কি? প্রথম অংশে কবি কি বলিয়াছেন; শেষের অংশের বক্তব্য কি?

৪। অর্থ বল: তিষ্ঠ ক্ষণকাল, জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম, মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত, দত্তকুলোদ্ভব, কবতক্ষ-তীরে।

প্রশ্ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মা গো, আমায় ছুটি দিতে বল্,
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা।
এখন আমি তোমার ঘরে বসে
করব শুধু পড়া-পড়া খেলা।
তুমি বলছ দুপুর এখন সবে,
না হয় যেন সত্যি হল তাই,
একদিনও কি দুপুরবেলা হলে
বিকেল হল মনে করতে নাই ?
আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে
সূর্যি ডুবে গেছে মাঠের শেষে,
বাগ্দি-বুড়ি চুবড়ি ভরে নিয়ে
শাক তুলেছে পুকুর-ধারে এসে।
আঁধার হল মাদার-গাছের তলা,
কালী হয়ে এল দিঘির জল,
হাটের থেকে সবাই এল ফিরে,
মাঠের থেকে এল চাষির দল।
মনে কর্-না উঠল সাঁঝের তারা,
মনে কর্-না সন্ধে হল যেন।
রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
দুপুর বেলা রাত হবে না কেন।

অনুশীলনী

১। ছন্দের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। শিশু মায়ের কাছে কি চাহিতেছে? 'আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে'—শিশু কি ভাবিতে পারে?

৩। ব্যাখ্যা কর ঃ রাতের বেলা........হবে না কেন?

কামনা

কামিনী রায়

ওহে দেব! ভেঙ্গে দাও ভীতির শৃঙ্খল,
ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন,
সমুদয় আপনারে দিই একেবারে
জগতের পায়ে বিসর্জন!

স্বামিন, নির্দেশ তব হৃদয়ে ধরিয়া
তোমারি নির্দিষ্ট করি কাজ—
ছোট হোক্, বড় হোক্, পরের নয়নে
পড়ুক বা না পড়ুক তাহে কেন লাজ?

তুমি জীবনের প্রভু, তব ভৃত্য হয়ে
বিলাইব বিভব তোমার;
আমার কি লাজ, আমি ততটুকু দিব
তুমি দেছ যে-টুকুর ভার।

ভুলে যাই আপনারে, যশ-অপবাদ
কভু যেন স্মরণে না আসে,
প্রেমের আলোক দাও, নির্ভয়ের বল,
তোমাতেই তৃপ্ত কর দাসে।

অনুশীলনী

১। কবি কাহার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন? তাঁহার কামনাগুলি কি?
২। ছন্দ ও ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কবিতাটি আবৃত্তি কর।
৩। অর্থ বল: শৃঙ্খল, বিসর্জন, স্বামিন, বিভব, যশ।

আমার দেশ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বঙ্গ আমার! জননি আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ!
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ?
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ?
সপ্ত কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে—"আমার দেশ"!

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধ জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর,
অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি-শেষ,
তুই কিনা মাগো তাঁদের জননী, তুই কিনা মাগো তাঁদের দেশ।

একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়,

সন্তান যার তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কিনা এই ধূলায় আসন, তার কিনা এই ছিন্নবেশ !

উঠিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাই কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস যেথা গাহিল গান,
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই তো মা সেই ধন্য দেশ !
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্ত-লেশ ।

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর,
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য, মানুষ আমরা নহি তো মেষ !
দেবি আমার ! সাধনা আমার ! স্বর্গ আমার ! আমার দেশ !

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন—"আমার দেশ" !

অনুশীলনী

১। 'আমার দেশ' বলিতে কবি কোন দেশকে বুঝাইতেছেন ? তার কিরূপ অবস্থা কবি দেখিতেছেন ?

২। টীকা লিখ : বুদ্ধ-আত্মা, অশোক, নিমাই, রঘুমণি, চণ্ডীদাস, প্রতাপাদিত্য।

৩। ব্যাখ্যা কর : যদিও মা তোর........আমার দেশ !

বাসনা

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

ছুট্‌ব আমি সরল প্রাণে
পর্ণ-কুটীর হ'তে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায়
ছুট্‌ব আলিপথে !
বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে,
শুকতারাটি জাগ্‌বে দূরে,
কান জুড়াবে পাখির গানে
সুরের মিঠে স্রোতে

এলিয়ে দেব নগ্ন বাহু
গাঙের রাঙা জলে,
ঝাঁপিয়ে প'ড়ে উজান যাব
ঢেউয়ের টলমলে ;
তুচ্ছ ক'রে জোয়ার-ভাঁটা,
এপার-ওপার সাঁতার-কাটা,
নাচবে আলো জলের বুকে
নীল আকাশের তলে।

বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে
মোতির 'সাত-নরী',
কদম-কেশর শিউরে উঠে
পড়বে ঝরি' ঝরি' ;

মাঠের কোণে যাবে দেখা
বৃষ্টি-ধারার 'চিকে'-ঢাকা
কেয়াঝাড়ের মাথার 'পরে
নারিকেলের সারি।

শিল কুড়িয়ে বাঁধব 'মোয়া',
লাঙ্গল দেব ভূঁয়ে,
কড়্ কড়্ কড়্ ডাকবে 'দেয়া',
আস্‌ব আমন রুয়ে।
আকাশ-ভাঙা মুষল-ধার,
বাঁশের ঝাড়ে কি তোলপাড়!
পাকুড় তেঁতুল ঝাউয়ের ঝাড়
পড়বে নুয়ে নুয়ে!

শুন্‌তে যাব ভারত-কথা,
রামায়ণের গান,
সীতার দুখে চোখের জলে
গল্‌বে মনঃপ্রাণ;
বনবাসের করুণ কথা
শুনতে বুকে বাজবে ব্যথা,
ফিরব ঘরে দুঃখভরে
ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ।

সারাদিনের শ্রান্তিভরা
শিথিল আঁখির পাতে
স্বপ্নহারা ঘুমের আরাম
ভোগ করিব রাতে !
না ফুটিতেই উষার আঁখি,
না ডাকিতেই ভোরের পাখি,
ঝঙ্কারিব 'জয় জগদীশ'
প্রাণের একতারাতে।

অনুশীলনী

১। ছন্দের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। কবি নিজেকে কিভাবে কল্পনা করিয়াছেন? তাঁহার বাসনাগুলি নিজের ভাষায় লিখ।

৩। ব্যাখ্যা কর : বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে, মোতির সাত-নরী, বৃষ্টি ধারার চিকে ঢাকা।

ছিন্ন-মুকুল

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সব-চেয়ে যে ছোট পিঁড়িখানি
সেইখানি আর কেউ রাখে না পেতে;
ছোট থালায় হয় নাকো ভাত বাড়া,
জল ভরে না ছোট্ট গেলাসেতে;
বাড়ির মধ্যে সব-চেয়ে যে ছোটো
খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে,
সব-চেয়ে যে শেষে এসেছিল
তারি খাওয়া ঘুচেছে সব আগে।

সব-চেয়ে যে অল্পে ছিল খুশী,
খুশী ছিল ঘেঁষাঘেঁষির ঘরে,
সেই গেছে, হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে,
দিয়ে গেছে, জায়গা খালি ক'রে !
ছেড়ে গেছে পুতুল পুঁতির মালা,
ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবি,
ভয়-তরাসে ছিল যে সব-চেয়ে
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি !

সব-চেয়ে যে ছোটো কাপড়গুলি,
সেগুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে ;
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোটো
আজকে সেটি শূন্য প'ড়ে কাঁদে !
সব-চেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে স'রে,
ছোট্ট যে জন ছিল রে সব-চেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য ক'রে !

অনুশীলনী

১। কবিতাটির নাম 'ছিন্ন-মুকুল' দেওয়া হইয়াছে কেন ?

২। 'সেই দিয়েছে সকল শূন্য করে'—'সেই' বলিতে কাহাকে বুঝানো হইতেছে ? সে চলিয়া যাওয়ায় কোন কোন কাজ বন্ধ হইয়াছে ?

অ-কেজোর গান

কাজী নজরুল ইসলাম

ঐ ঘাসের ফুলে মটরশুটীর ক্ষেতে
আমার এ মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে আজ মেতে ॥

এই রোদ-সোহাগী পউষ-প্রাতে
অথির প্রজাপতির সাথে
বেড়াই কুঁড়ির পাতে পাতে
পুষ্পল মৌ-ক্ষেতে !
আমি আমন ধানের বিদায়-কাঁদন শুনি মাঠে রেতে ।

আজ কাশ-বনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কুলে,
ও তার হ'ল্‌দে আঁচল চ'লতে জড়ায় অড়হড়ের ফুলে !
ঐ বাব্‌লা ফুলে নাকছাবি তার,
গা'য় শাড়ী নীল অপরাজিতার,
চ'লেছি সেই অজানিতার
উদাস পরশ পেতে ।
আমায় ডেকেছে সে চোখ-ইশারায় পথে যেতে যেতে ॥

ঐ ঘাসের ফুলে মটরশুটীর ক্ষেতে,
আমার এ মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে তাই মেতে ॥

অনুশীলনী

১। কবির মন কোথায়, এবং কেন মাতিয়া উঠিয়াছে? কবি পউষ প্রাতে কি করিতেছেন?

২। ব্যাখ্যা কর: আজ কাশবনে.........উদাস পরশ পেতে।

৩। অর্থ বল: প্লুষ্পল মৌক্তেত, বিদায়-কাঁদন, অজানিতা।

গন্ধ বিচার

সুকুমার রায়

সিংহাসনে বস্‌ল রাজা বাজল কাঁসর ঘণ্টা,
ছট্‌ফটিয়ে উঠল কেঁপে মন্ত্রীবুড়োর মনটা।
বল্‌লে রাজা, মন্ত্রী তোমার জামায় কেন গন্ধ?
মন্ত্রী বলে, এসেন্স দিছি—গন্ধ তো নয় মন্দ!
রাজা বলেন, মন্দ ভালো দেখুক শুঁকে বদ্যি,
বদ্যি বলে, আমার নাকে বেজায় হল সর্দি।
রাজা হাঁকেন, বোলাও তবে, রামনারায়ণ পাত্র।
পাত্র বলে, নস্যি নিলাম এক্ষনি এইমাত্র,
নস্যি দিয়ে বন্ধ যে নাক গন্ধ কোথায় ঢুকবে?
রাজা বলেন, কোটাল তবে এগিয়ে এস, শুঁকবে।
কোটাল বলে, পান খেয়েছি মশলা তাতে কর্পূর,
গন্ধে তারি মুণ্ড আমার এক্কেবারে ভরপুর।
রাজা বলেন, আসুক তবে শের পালোয়ান ভীমসিং,
ভীম বলে, আজ কচ্ছে আমার সমস্ত গা ঝিম্ ঝিম্।
রাত্রে আমার বোখার হল বলছি হুজুর ঠিক বাৎ,
ব'লেই শুল রাজ সভাতে চক্ষু বুজে চিৎপাত।

রাজার শালা চন্দ্রকেতু তারেই ধ'রে শেষটা,
বল্‌ল রাজা, তুমিই না হয় কর না ভাই চেষ্টা।
চন্দ্র বলেন, মারতে চাওতো ডাকাও নাকো জল্লাদ,
গন্ধ শুঁকে মরতে হবে এ আবার কি আহ্লাদ ?
ছিল হাজির বৃদ্ধ নাজির বয়সটি তার নব্বই,
ভাবল মনে, ভয় কেন আর একদিন তো মরবই।
সাহস করে বল্‌লে বুড়ো, মিথ্যে সবাই বকছিস্,
শুঁকতে পারি হুকুম পেলে এবং পেলে বকশিশ।
রাজা বলেন, হাজার টাকা ইনাম পাবে সদ্য,
তাই না শুনে উৎসাহেতে উঠল বুড়ো মদ্দ।
জামার পরে নাক ঠেকিয়ে—শুঁকলো কত গন্ধ,
রইল অটল দেখল লোকে বিস্ময়ে বাক্ বন্ধ।
রাজ্যে হল জয়-জয়কার বাজল কাঁসর ঢক্কা,
বাপ রে কি তেজ বুড়োর হাড়ে পায় না সে যে অক্কা।

অনুশীলনী

১। মন্ত্রীর জামায় কিসের গন্ধ ছিল ? সেই গন্ধ বিচার করিতে কাহারা ভয় পাইয়াছিল ? তাহারা কি কি কারণে গন্ধ শুঁকিতে রাজী হয় নাই ?

২। শেষ পর্যন্ত কে এবং কেন গন্ধ বিচারে রাজী হইল ? তাহার কীর্তি দেখিয়া সকলে কি করিল ?

রূপাই

জসীম উদ্দীন

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল,—
কালো মুখেই কালো ভ্রমর ! কিসের রঙীন ফুল ?
কাঁচা-ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া ;
তা'র সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া ।
জালি-লাউয়ের ডগার মত বাহু দু'খান সরু ;
গা'খানি তা'র শাঙন-মাসের যেমন তমাল-তরু ।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজলী-মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল্ ।
কচি ধানের তুল্‌তে চারা হয়ত' কোনো চাষী
মুখে তাহার ছড়িয়ে গেছে কতকটা তা'র হাসি ।

আখ্‌ড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি ।
'জারী'র গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
'শাল-সুন্দী' বেত যেন ও, সকল কাজেই লাগে ।
বুড়োরা কয়,—'ছেলে নয়, ও পাগল লোহা যেন ;
রূপাই যেমন বাপের বেটা, কেউ দেখেছে হেন ?
যদিও রূপা নয়কো রূপাই,—রূপার চেয়ে দামী,
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামী ।'

অনুশীলনী

১। রূপাই কে? কবিতাটিতে তাহার সৌন্দর্যের যে বর্ণনা আছে তাহা নিজের ভাষায় লিখ।

২। 'এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে 'নামী'—কথাগুলি কাহারা এবং কেন বলিত?

৩। অর্থ বল : বাদল-ধোয়া মেঘ, জারী-গান, শালসুন্দী, পাগল-লোহা।

কুকুরপাগল

অন্নদাশঙ্কর রায়

(১)

লোকটা ছিল কুকুরপাগল।
কুকুরবাবু খাবেন বলে
গণ্ডা কয়েক পুষলো ছাগল।
ছাগলগুলোয় চরতে দিতে
করতে হলো ঘাসের বাহার।
ঘাসের গোড়ায় না দিলে নয়
চিলি দেশের আমদানি সার।
সারের জন্যে গাড়ি লাগে
গাড়ির জন্যে বলদ বাহন।
বলদজোড়ার জন্যে আবার
খড় কেনা হয় কাহন কাহন।
খড়ের গাদায় লাগলে আগুন
জলদি জলদি জল যে চাই।
জলের জন্যে পুকুর কাটাও
মুনিষ খাটাও শ'আড়াই।

(২)

তারপরে কী হলো, জানো ?
কুকুরাবাদ গাঁয়ের লোক
মুশকিলেতে পড়ল সবাই
কুকুর যেদিন বুজল চোখ।
আড়াই শ' জন বেকার নিয়ে
জমি বৃহৎ একার নিয়ে
খড়ের গাদায় আগুন নিয়ে
ছাগল ছানা ছ'গুণ নিয়ে
গাড়ি নিয়ে বলদ নিয়ে
গোঁজামিল ও গলদ নিয়ে
লোকটা হলো আস্ত পাগল।
সব কিছু তার হাতিয়ে নিল
আগরওয়ালা গণ্ডেরীমল।
মানুষ হলো ছাঁটাই
ঘাস হলো কাটাই
ওজন দরে বিক্রি হ'ল
সকল কটা পাঁঠাই।
বলদ গেল পিঁজরাপোলে
রইল নাকো ল্যাঠাই।

মনের সুখে রাজ্য করে
পরমপুরুষ গণ্ডেরীমল
কেউ জানে না কোথায় গেল
সেই আমাদের কুকুরপাগল।

অনুশীলনী

১। কুকুর পুষিতে কুকুরপাগল কি কি করিয়াছিল ?
২। কুকুর মারা যাইবার'পর কি ঘটিল ?
৩। গণ্ডেরীমলের হাতে পড়িয়া তাহার সব কিছুর কি দশা হইল ?

এক যে ছিল

সুকান্ত ভট্টাচার্য

এক যে ছিল আপনভোলা কিশোর,
ইস্কুল তার ভাল লাগত না,
সহ্য হত না পড়াশুনার ঝামেলা
আমাদের চলতি লেখাপড়া সে শিখল না কোনোকালেই,
অথচ সে ছাড়িয়ে গেল সারা দেশের সবটুকু পাণ্ডিত্যকে।
কেমন ক'রে ? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না ॥

বড়মানুষীর মধ্যে গরীবের মত মানুষ,
তাই বড় হয়ে সে বড়মানুষ না হয়ে
মানুষ হিসেবে হল অনেক বড়।
কেমন ক'রে ? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না ॥

গানসাধার বাঁধা আইন সে মানে নি,
অথচ স্বর্গের বাগান থেকে সে চুরি ক'রে আনল
তোমার আমার গান।
কবি সে, ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল না ছোট বয়সে,

অথচ শিল্পী ব'লে সে-ই পেল শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সম্মান।
কেমন ক'রে? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না॥

মানুষ হল না ব'লে যে ছিল তার দিদির আক্ষেপের বিষয়,
অনেক দিন, অনেক বিদ্রূপ যাকে করেছে আহত;
সে-ই একদিন চমক লাগিয়ে করলো দিগ্বিজয়।
কেউ তাকে বলল, 'বিশ্বকবি', কেউ বা 'কবিগুরু'
উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চারিদিক করল প্রণাম।
তাই পৃথিবী আজো অবাক হয়ে তাকিয়ে বলছে:
কেমন ক'রে? সে প্রশ্ন আমাকে ক'রো না,
এ প্রশ্নের জবাব তোমাদের মত আমিও খুঁজি॥

অনুশীলনী

১। আপন ভোলা কিশোর কে? কবি তাঁহার চরিত্রের কোন্ কোন্ আশ্চর্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন?

২। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চারিদিক করল প্রণাম—কি কারণে তিনি বিশ্বের প্রণাম পাইয়াছিলেন?

৩। ব্যাখ্যা কর: সে বড়মানুষ না হয়ে
মানুষ হিসেবে হল অনেক বড়।

নির্দেশিকা

শৈশব কথা : রচনাটি 'বিদ্যাসাগর চরিত' থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে নেওয়া হয়েছে। শব্দার্থঃ দেহাত্যয়—দেহের বিনাশ, পিতৃব্য—কাকা, সম্ভাষণ—সম্বোধন, সৌম্যমূর্তি—শান্ত চেহারা, সুবর্ণবণিক—সোনার ব্যবসায়ী, বৈগুণ্যবশত—পরিবর্তন হওয়ার জন্যে, অভিপ্রেত—মনোগত।

মন্বন্তর : রচনাটি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অংশ বিশেষ থেকে সংক্ষেপিত। শব্দার্থ : মন্বন্তর—দুর্ভিক্ষ, মহার্ঘ—অতি মূল্য যার, সরফরাজ—প্রধান, রাজস্ব—রাজার কর, রোগ সময় পাইল—রোগের সময় এল, প্রাদুর্ভাব—উদ্ভব, বপু—শরীর।

বালক রামতনু ও ডেবিড হেয়ার : রচনাটি 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে গৃহীত। শব্দার্থ : লাহিড়ী মহাশয়—রামতনু লাহিড়ী। উনিশ শতকের একজন কৃতী পণ্ডিত ও শিক্ষক। উদ্বিগ্ন—উৎকণ্ঠিত, সন্নিকটে—নিকটে, প্রবিষ্ট—যে প্রবেশ করিয়াছে, কুলীন—উত্তম বংশ, অপ্রতুল—অভাব, উত্যক্ত—বিরক্ত, me poor… …your school—আমি গরীব ছাত্র, দয়া করে আপনার স্কুলে আমাকে ভর্তি করুন।

ছেলেবেলার স্মৃতি : রচনাটি লেখকের 'ছেলেবেলা' গ্রন্থের অংশ বিশেষ। শব্দার্থ : সীতার বনবাস—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখিত গ্রন্থ। মেঘনাদ বধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা কাব্যগ্রন্থ। মুগ্ধবোধ—বোপদেব কৃত ব্যাকরণ।

সুয়েজ খালে : হাঙ্গর শিকার : ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজির দ্বিতীয়বার য়ুরোপ যাত্রা পথের অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে লিখিত আছে। রচনাটি পরিব্রাজকের একটি অংশ থেকে সংক্ষেপিত। শব্দার্থ : বন্দর—সমুদ্র বা নদীর তীরে বাণিজ্য করবার স্থান, জাতক্রোধ—অত্যন্ত রাগ, গাঙ্‌ধাড়া—বকঠুঁটো মাছ। আকর্ণ বিস্তার হাসি—কান পর্যন্ত বিস্তৃত হাসি, কর্ণকুহর—কর্ণের ছিদ্র। লবণসমুদ্রজন্মা—সমুদ্রের লোনা জলে জন্ম যার, উদরাগ্নি—পেটের জ্বালা, ভস্মাবশেষ—ছাই, ক্ষুধার আগুন।

সগর রাজার কথা : লেখকের 'মহাভারতের কথা' গ্রন্থ থেকে রচনাটি সংক্ষেপিত। শব্দার্থ : ইক্ষ্বাকু বংশ—সূর্য বংশীয় রাজাদের আদিপুরুষ। শ্রীরামচন্দ্র এই বংশেই জন্মেছিলেন। সগর—স (সহ) গর (বিষ)—বিষের সঙ্গে জাত বলে এঁর নাম সগর। অশ্বমেধ—প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজারা এই যজ্ঞ করতেন। সকল যজ্ঞের মধ্যে অশ্বমেধই প্রধান। কপিল—বিখ্যাত ঋষি। ইনি সাংখ্যদর্শন রচনা করেছিলেন।

চৈতন্যদেব : 'শিশু ভারতী'তে প্রকাশিত 'চৈতন্যদেব' প্রবন্ধ থেকে সংক্ষেপিত। শব্দার্থ : তৎকৃৎ—তাহার দ্বারা সম্পন্ন, টোল—সংস্কৃত পাঠশালা, অজাতশ্মশ্রু—যার দাড়ি ওঠে নি, ঈশ্বরপুরী—বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী, ইনি চৈতন্যদেবকে দীক্ষা দেন, বিষ্ণুপাদপদ্ম—পদ্মের মতো ভগবান বিষ্ণুর চরণ, বৃন্দাবন—মথুরার কাছে বৈষ্ণবদের তীর্থক্ষেত্র, শ্রীবাস—শ্রীহট্টবাসী ব্রাহ্মণ। পিতার বন্ধু হিসাবে চৈতন্যদেব তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, কৌশল্যা—রাজা দশরথের স্ত্রী।

বুদ্ধকথা : রচনাটি নালকের অংশবিশেষ থেকে সংক্ষিপ্তাকারে গৃহীত। শব্দার্থ : কপিলবাস্তু—হিমালয়ের নিচে রাজা শুদ্ধোদনের রাজধানী, গণৎকার—ভবিষ্যৎ গণনা করেন যাঁরা।

রামের কীর্তি : কাহিনীটি লেখকের 'রামের সুমতি' উপন্যাসের অংশবিশেষ থেকে সংক্ষেপিত। শব্দার্থ : দেবর—স্বামীর ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র—ভ্রাতার পুত্র, স্তম্ভিত—অবরুদ্ধ।

প্রাচীন ভারতের উদ্ভিদশাস্ত্র : রচনাটি লেখকের 'গাছপালা' গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্তাকারে নেওয়া হয়েছে। শব্দার্থ : অন্তর্গত—ভিতর, নিত্য ব্যবহার্য—যা রোজ ব্যবহার করা হয়।

আতুরী ডাইনী : কাহিনীটি লেখকের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে গৃহীত। শব্দার্থ : সঙ্কল্প—বাসনা, সাঙ্গ—শেষ, উপেক্ষা—অগ্রাহ্য, আশঙ্কা—ভয়, ক্রূরদৃষ্টি—কঠিন দৃষ্টি, আর্তরব—কাতর-ধ্বনি।

বীরসা ভগবান : শিশু ভারতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে রচনাটি সংক্ষিপ্ত আকারে গৃহীত। শব্দার্থ : আদিবাসী—প্রাচীন অধিবাসী, নাড়ীর

যোগ—নাড়ীর সঙ্গে যোগ, সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ—সব দিক সম্পূর্ণ, সমরনীতি—যুদ্ধের নীতি, অনুপ্রাণিত—উৎসাহিত, গৌরবোজ্জ্বল—গৌরবে উজ্জ্বল, জীবনান্ত—মৃত্যু।

প্রার্থনা ঃ ছোটখাটো বিপদে পড়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রতিদিনই প্রার্থনা করি। কবির প্রার্থনা সে জাতীয় নয়। নির্ভীক মন নিয়ে তিনি যেন সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে পারেন, এই কবির কামনা। শব্দার্থ: দুঃখ-তাপ—দুঃখকষ্ট, বঞ্চনা—প্রতারণা, নম্রশিরে—মাথা নত করে, নিখিল ধরা—সমস্ত জগত, সংশয়—সন্দেহ।

ভরতের রাজ্যশাসন: ভরত রামচন্দ্রের কাছে এসে তাঁর পাদুকা প্রার্থনা করলেন। রামচন্দ্র সম্মত হলে ভরত নন্দিগ্রামে এলেন পাদুকার অভিষেক করবার জন্যে। শব্দার্থঃ সবিনয়—বিনয়ের সঙ্গে, প্রাণাধিক—প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়, পাট করি—রাজধানী নির্মাণ করে, পালিহ—পালন করো, বিশ্বকর্মা—দেবশিল্পী, পাট্ট—বহুমূল্য রেশমী বস্ত্র, কৃষ্ণসার চর্ম—এক জাতীয় হরিণের চামড়া, সুধাভাণ্ড—সুধার পাত্র।

দক্ষযজ্ঞনাশ: কবিতাটিতে সতীর দেহত্যাগের পর ক্রুদ্ধ শিবের দক্ষযজ্ঞ নাশের বর্ণনা আছে। শব্দার্থ: ভূতনাথ—শিব, ভূতসাথ—ভূতগণের সঙ্গে, রক্ষ—ভূতযোনি, প্রেতভাগ—মৃত মানুষের দেহধারী জীব, সানুরাগ—প্রাণ খুলে, সৈন্যসূত—যে মন্ত্র উচ্চারণ করে আহুতি দিলে আপনা আপনি সৈন্য জন্মায়, ঢালি—যারা ঢাল নিয়ে যুদ্ধ করে, মাহুতি—গজ সৈন্য, বৈরীপক্ষ—শত্রু পক্ষীয়, হুঁদিখাও—দর্পের সঙ্গে গর্জন করে অগ্রসর হও, সে সভায়...... নিবৃত্তি—রুদ্র আপনতেজে দক্ষের সৈন্যগণকে নিজ দেহে মিশিয়ে নিলেন, নন্দিভৃঙ্গী—শিবের অনুচরদ্বয়, ভার্গব, ভৃগু ঋষির পুত্র, যজ্ঞের পুরোহিত, পূষণ—অগ্নিদেবতার এক নাম। তৃণক—আলোচ্য কবিতাটির ছন্দের নাম, ছন্দোবন্ধ—ছন্দের বাঁধুনি।

সমাধিলিপি: বাঙালী পথিকের কাছে কবির আবেদন, চলার পথে তারা যেন কবির সমাধি ফলকের সামনে ক্ষণেকের জন্য দাঁড়ায়, কারণ এই সমাধির নিচে ঘুমিয়ে আছেন কবি। শব্দার্থ: তিষ্ঠ ক্ষণকাল—কিছুক্ষণ

দাঁড়াও, জননীর কোলে……বিরাম—মায়ের কোলে শিশু যেমন বিশ্রাম করে, মহীর পদে—মাটির নিচে, দত্তকুলোদ্ভব—দত্ত পরিবারে জন্ম যাঁর, কবতক্ষ-তীরে—কবতক্ষ নদীর তীরে।

প্রশ্ন : ঘরে বসে নিয়মমাফিক পড়াশোনা করতে একটুও ভালো লাগে না শিশুর। দুপুরবেলা খেলা করায় মায়ের নিষেধ আছে। খোকা কিন্তু মনে মনে দুপুর বেলাতেই বিকেলের কথা কল্পনা করতে পারে। খোকন ভেবে পায় না, সবাই যদি 'রাত-দুপুর' বলতে পারে, তবে দুপুর রাতের কথা ভাবতে দোষ কি।

কামনা : কবি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন, তিনি যেন সমস্ত ভয়ভীতির বন্ধন ঘুচিয়ে জগতের সেবায় আত্মসমর্পণ করতে পারেন। ঈশ্বরের দাস হিসাবে সংসারের ছোট বড়'র ব্যবধান ভুলে, তাঁর উপর অর্পিত কাজেই তাঁর তৃপ্তি। শব্দার্থ : শৃঙ্খল—বন্ধন, বিসর্জন—পরিত্যাগ, স্বামিন্—প্রভু, বিভব—মহত্ব, সম্পদ, যশ—কীর্তি।

আমার দেশ : কবি বাংলাদেশের দীন-হীন, মলিন বেশ দেখে ব্যথিত। একদা এইদেশ তাঁর কৃতী সন্তানের কীর্তিতে উজ্জ্বল ছিল। তাই কবি আবার বাংলাদেশকে পূর্বগৌরবে ফিরিয়ে আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শব্দার্থ : বুদ্ধ-আত্মা—তথাগত বুদ্ধের বাণী। অশোক—মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও বিন্দুসারের পুত্র। নিমাই—চৈতন্যদেব। রঘুমণি—প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। চণ্ডীদাস—বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস, প্রতাপাদিত্য—প্রতাপাদিত্য রায়। বঙ্গের বিখ্যাত রাজা।

বাসনা : কবিতাটিতে শব্দ দিয়ে কবি চমৎকার কতকগুলি ছবি এঁকেছেন, যার ভেতর দিয়ে গ্রামের জীবনধারার সঙ্গে প্রকৃতির মিলগুলি ভারী সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। শব্দার্থ : আলিপথ—আইল বা আল, বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে—ঘন বন ও রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে। মোতির সাত-নরী—মুক্তোর মতো জলবিন্দু ঘাসের ওপর সাত-নরী হারের মতো ছড়িয়ে পড়বে। বৃষ্টিধারার চিকে ঢাকা—বৃষ্টির সারি সারি ধারা মিলে যেন একখানা চিক রচনা করবে।

ছিন্ন-মুকুল : একটি শিশুর অকাল মৃত্যুতে চারিদিকের শূন্যতাটি ভারী সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে কবিতাটিতে। শব্দার্থ : সেই খুলেছে আঁধার

ঘরের চাবি—একা চলতে যে ভয় পেত, আজ মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্যে সে-ই সবার আগে চলে গেল।

অ-কেজোর গান : কবি সাধারণ মানুষের মতো কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চান না, পউষের মাঠ আর কাশবনের স্নিগ্ধতার ছোঁয়া পাবার জন্যেই তিনি অনেক বেশি আকুল। প্রকৃতির ডাকে তাই কবি সাড়া দিতে চান। শব্দার্থ : পুষ্পল মৌ-ক্ষেতে—মধুতে ভরা অজস্র ফুলের মাঝে। বিদায় কাঁদন—বিদায় নেবার কান্না, অজানিতা—প্রকৃতিকে কবি একজন অপরিচিতা মহিলার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

গন্ধ বিচার : মন্ত্রীর জামায় গন্ধ আবিষ্কার করতে গিয়ে কি সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তাই কবিতাটিতে বলা হয়েছে। কবিতাটির সহজ সরল প্রকাশ ভঙ্গীটি লক্ষ্য কর।

রূপাই : শহরের লোকের রূপের মধ্যে একটা পরিচ্ছন্নতা আছে বটে, কিন্তু গ্রামের চাষীর স্বাস্থ্যবান দেহের লাবণ্যের কাছে তা অনেক ম্লান। কবিতাটিতে তেমনি এক গ্রাম্য চাষীর রূপ বর্ণনা করা হয়েছে। শব্দার্থ : কালো মুখেই……রঙিন ফুল ?—চুলগুলি ঘন কালো—যেন একদল ভ্রমর রঙীন ফুল ছেড়ে তার কালো মুখের ওপর বসেছে। বাদল ধোয়া মেঘ—বর্ষার মেঘের মতো উজ্জ্বল কালো। জারীর গান—এক রকম পাঁচালী ও কবিগান। শাল-সুন্দী—এক জাতীয় বেত। পাগল লোহা—ইস্পাত।

কুকুরপাগল : কুকুর পোষার উদ্ভট খেয়ালে এক কুকুরপাগলের শেষ পর্যন্ত কি দশা হয়েছিল, ছড়াটিতে তারই সুন্দর কাহিনীটি আছে। ভাষার সরলতা, শব্দের চমৎকার ব্যবহার কবিতাটির বৈশিষ্ট্য।

এক যে ছিল : স্কুল কলেজে পড়েন নি রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তিনিই পেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সম্মান। বিশাল ধনীর সন্তান হয়েও কখনো তিনি দেশের দরিদ্র মানুষের কথা ভোলেন নি। গান ও শিল্পচর্চার বাঁধা রীতিনীতি না মেনেও তিনি অর্জন করেছিলেন শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সম্মান। পরিচিত নিয়ম অনুযায়ী তিনি বড়ো হন নি বলে রবীন্দ্রনাথের ন'দি স্বর্ণকুমারী দেবীর আক্ষেপ ছিল। কিন্তু সকলের ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে রবীন্দ্রনাথ গড়ে উঠেছিলেন এক বিশাল মানুষ হিসেবে।